Contents

ইসলাম স্বীকৃত অধিকার

حقوق دعت إليها الفطرة وقررها الشريعة

(باللغة البنغالية)

মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহ.)

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্ফান

(এম.এম. ফার্স্ট ক্লাস, লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্দ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد!

মানুষের পরস্পরের প্রতি যে অধিকার বিদ্যমান এবং আল্লাহর জন্য মানুষের কি করণীয় ও তাদের পরস্পরের জন্য কি করণীয় তা জানা ও বাস্তবায়ন করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়।

আমি দুটি কথায় যে পুস্তিকাটির উপস্থাপনা করছি, তাতে কতিপয় পয়েন্টে সংক্ষিপ্তাকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানুষের নিজের কি প্রাপ্য ও অপরের প্রতি তার কি অধিকার ও করণীয়।

আল্লাহ এর সংকলককে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন, এবং তাঁর ইলমের দ্বারা জনসাধারণকে উপকৃত করুন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল আল্লাহর অধিকার, আর তা বাস্ত বায়ন হবে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্খা, তাঁর অনুসরণ, তাঁর সার্বিক আদেশ পালন, নিষেধ ও হারাম সমূহ থেকে বিরত এবং যে তার অনুসরণ করবে তাকে ভালবাসা ও যে তার অবাধ্য তার সাথে বৈরিতা রাখার মাধ্যমে।

এরপর অধিকার হল নাবী (ﷺ) এর। তাঁর প্রতি ভালবাসা, তাঁর আদেশের অনুসরণ ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা, তাঁর সুন্নাতের মদদ ও আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি বেশী-বেশী দরূদ ও সালাম পাঠের মাধ্যমে এ অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে।

এর পর আত্মীয়-স্বজনের অধিকার। এ অধিকার আত্মীয়তার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের মধ্যে শির্ষাধিকার হচ্ছে পিতা-মাতার। সুতরাং তাদের দুজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচারণ ও যতক্ষণ

তারা আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ না করবে তাদের আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং তাদের জন্য জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর দোয়া করা অপরিহার্য।

সন্তান-সন্ততির অধিকার হলো তাদেরকে লেখাপড়া শিখানো এবং সঠিক ভাবে লালন-পালন করা ও উত্তম আদব ও চরিত্রের শিক্ষা দেয়া। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে উত্তম জীবন যাপন করা ও পরস্পরে দ্বীনদারী ও সৎকার্যে সহযোগিতা করা।

প্রতিবেশীর অধিকার হলো, তাদের সাথে কথায় ও কাজে সদ্ব্যবহার করা এবং কথায় কাজে তাদেরকে কষ্ট না দেয়া।

সাধারণ মুসলমানদের অধিকার হলো, সালাম প্রদান, রোগীর সেবা, হাঁচী দাতার দোয়ার জবাব, দাওয়াত করলে গ্রহণ করা, পরস্পরে হিতাকাঙ্খী হওয়া, শপথকরীর সাথে সদ্ব্যবহার, মাজলূম-নির্যাতিতর সাহায্য, জানাযায় অংশ গ্রহণ, নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্য তা পছন্দ করা, তেমনি নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অপরের জন্যও অপছন্দ করা এবং পরস্পরে সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।

আমি পুস্তিকাটি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি, এর আয়াতগুলির নম্বর লাগিয়েছি এবং যে সমস্ত হাদীসের তাখরীজ ছিলনা তাখরীজ করেছি। পুস্তিকাটি আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূলের বাণীর আলোকে সংকলিত। সুতরাং আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এর সংকলক এবং যারা এর সহযোগিতায় রয়েছে তাদের কল্যাণ ও বড় প্রতিদান কামনা করি।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..

আব্দুল্লাহ বিন জারুল্লাহ আল জারুল্লাহ (রহ:)
২১/১০/১৪০৬ হিঃ

বিবেক সম্মত ও ইসলাম স্বীকৃত অধিকারসমূহ

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা চাই, তাঁরই নিকট তওবা করি এবং আমাদের অন্তরের খারাপী ও আমাদের পাপ কর্ম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দিবেন তাকে পথ ভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারবেনা। আমি সাক্ষ্য দেই যে এক আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দেই যে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً أما بعد:

আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের সৌন্দর্য, আদর্শ ও বৈশিষ্ট এবং ন্যায়-ইনসাফের দাবীই হলো, বাড়াবাড়ি ও উপেক্ষা ছাড়াই প্রত্যেক হকদারের হক-অধিকার প্রদান করা তাই আল্লাহ তায়ালা ও আদেশ করেন ইনসাফ ও ইহসানের। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছেন যুগে যুগে রাসূল। অবতীর্ণ করেন ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এজন্য ইহকাল ও পরকালের বিধি-বিধান।

যেহেতু ইনসাফ অর্থ প্রত্যেক হকদারের হক বুঝিয়ে দেয়া ও প্রত্যেক মান-সম্মানের অধিকারীকে তার যথা স্থানে স্থান

দেয়া। আর হকদারের হক প্রদানের জন্য সেগুলি জানা অপরিহার্য।

এইজন্য আমি গুরুত্ব পূর্ণ হক্ব-অধিকার সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করলাম মানুষ যেন সাধ্যমত তা জেনে নেয় ও আদায় করে।

অধিকার সমূহ নিম্নরূপ:

১। আল্লাহ তায়ালার অধিকার

২। নাবী (ﷺ) এর অধিকার

৩। পিতা-মাতার অধিকার

৪। সন্তানের অধিকার

৫। আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

৬। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

৭। শাসক ও জনগণের অধিকার

৮। প্রতিবেশীর অধিকার

৯। সাধারণ মুসলিমের অধিকার

১০। অমুসলিমের অধিকার

এই পুস্তিকায় উক্ত অধিকারসমূহই সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করছি।

প্রথম: আল্লাহ তায়ালার অধিকার

এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বড় অধিকার: কেননা এটি মহান সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তায়ালার অধিকার, এ অধিকার হলো সুমহান বাদশাহর সুস্পষ্ট অধিকার, যিনি চিরঞ্জিব ও আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর তত্ত্বাবধায়ক, তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করে সুনিপন ভাবে তা নিরূপণ করনে। সেই আল্লাহর অধিকার যিনি আপনাদেরকে একেবারে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, সেই আল্লাহর অধিকার যিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় আপনাকে ত্রীবিধ অন্ধকারে নেয়ামত দিয়ে প্রতিপালন করেন। যে অবস্থায় সৃষ্টি জীবের এমন কেউ ছিলনা, যে আপনাকে সেখানে রুজী পৌঁছাবে, না কেউ এমন ছিল, যে আপনার বাঁচার বা বৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা করবে। যিনি আপনার জন্য মায়ের স্তনের মধ্যে উপযোগী দুধের ব্যবস্থা করেন, যিনি আপনাকে (সৎ ও অসৎ) দুটি পথের বর্ণনা দেন, যিনি আপনার জন্য পিতা-মাতাকে বশে এনে দেন, যিনি আপনাকে সাহায্য ও প্রতিষ্ঠিত করেন। যিনি আপনাকে নেয়ামত, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বুঝ দান করে সহযোগিতা করেন এবং আপনাকে সেগুলি গ্রহণ ও তা

থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা দিয়ে তৈরি করেন যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (سورة النحل:٧٨)

অর্থাৎ: আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় বের করেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা নাহাল: ৭৮)

আল্লাহ যদি আপনার নিকট থেকে চোখের এক পলক পরিমাণ সময় তাঁর অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেন তবে আপনি তখনই ধ্বংস হয়ে যাবেন। তেমনি তিনি যদি আপনার নিকট থেকে এক মুহূর্তও তাঁর রহমত বন্ধ রাখেন আপনি জীবিত থাকতে পারবেন না। অতএব, আপনার প্রতি যদি আল্লাহর এরূপ অনুগ্রহ ও রহমত হয়ে থাকে তবে আপনার উপরও আল্লাহর সবচেয়ে বড় অধিকার রয়েছে। কেননা সে অধিকার হলো: আপনাকে সৃষ্টির অধিকার, বানানোর অধিকার এবং আপনাকে সাহায্য করার অধিকার। আর এজন্য তিনি আপনার নিকট না কোন রুজী চান, না খাদ্য-খোরাক চান, যেমন তিনি বলেন:

﴿لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ (سورة طه:١٣٢)

অর্থাৎ: আমি তোমার নিকট কোন রুজী-রোজগার চাইনা বরং আমি তোমাকে রুজী দান করে থাকি আর শেষ-শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা ত্বাহা: ১৩২)

আল্লাহ তায়ালা আপনার নিকট একটি মাত্র জিনিস চান, যা আপনারই কল্যাণের জন্য, আর তা হলো: আপনি একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবেন যার কোন অংশীদার নেই। তাই তো তিনি ইরশাদ করেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.﴾ (سورة الذاريات:٥٦-٥٨)

অর্থাৎ: আমি জ্বিন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে কোন রুজী চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে নিশ্চয়ই আল্লাহই তো মহা রিজিকদাতা ও প্রবল শক্তিধর। (সূরা জারিয়াত: ৫৬-৫৮)

তিনি চান যে আপনি তাঁর পূর্ণরূপে একান্ত বান্দায় পরিণত হবেন, যেমন ভাবে তিনি আপনার সার্বিক প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তিনিই আপনার প্রতিপালক। অতএব, আপনি বিনয়ী, নম্র, অধীন ও তাঁর আদেশের আনুগত্যশীল বান্দাই পরিণত হন, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়াদী হতে বাঁচুন, তাঁর দেয়া খবরাদী সত্য জানুন। কেননা আপনি তো দেখছেন, আপনার প্রতি তাঁর ক্রমাগত পর্যাপ্ত নেয়ামত সমূহ, সুতরাং আপনার লজ্জাও হবে না যে, আপনি এ সমস্ত নেয়ামতের পরিবর্তে অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। কোন মানুষ যদি কোন ক্ষেত্রে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকে তবে আপনি তার অবাধ্যতা ও বিরোধিতাই উপনিত হতে অবশ্যই লজ্জা পান। অতএব, আপনার প্রতি যত অনুগ্রহ রয়েছে সব তো তাঁরই পক্ষ থেকে আবার যত অপকারিতা, খারাপী ও বিপদ- আপদ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন তা তো সব তাঁরই রহমত। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ (سورة النحل:٥٣)

অর্থাৎ: তোমরা যে সব অনুগ্রহ ভোগ কর তা তো আল্লাহরই পক্ষ হতে, আবার যখন দুঃখ কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুল ভাবে আহবান কর। (সূরা নাহাল: ৫৩)

এই অধিকার আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য অপরিহার্য করেছেন, যার প্রতি আল্লাহ তা সহজ করেন তার জন্য এসব অতি সামান্য ও সরল-সহজ। কেননা এগুলি আল্লাহ কোন জটিল, সংকীর্ণময় ও কষ্টসাধ্য করেন নি, যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (سورة الحج:٧٨)

অর্থাৎ: আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাত তিনি পূর্বে তোমাদের নাম করণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও; যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা মানব জাতির জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ হও সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবূত ভাবে অবলম্বন কর, তিনিই তোমাদের অভিভাবক কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি। (সূরা হাজ্জ: ৭৮)

এটিই সর্বোত্তম আকীদা-ধর্মমত, প্রকৃত ঈমান ও লাভজনক সৎ আমল। আকীদার মূল ভিত্তি হলো: আন্তরিকতা ও বড়ত্ব প্রকাশ এবং ইখলাস ও অবিচলতা হলো আকীদার প্রতিফল।

নামায: দিবা-রাত্রীতে নামায পাঁচ ওয়াক্ত। যার মাধ্যমে আল্লাহ পাপ সমূহ মিটিয়ে দেন, মর্যাদা বুলন্দ করেন ও হৃদয় ও অবস্থা পরিমার্জিত করেন। তাই তাঁর বান্দাগণ সাধ্যমত তা আঞ্জাম দিবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (سورة التغابن:١٦)

অর্থাৎ: তোমাদের যতটুকু সম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা তাগাবূন: ১৬)

নাবী (ﷺ) অসুস্থ ইমরান ইবনে হুসাইনকে বলেন: "দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি না পার তো বসে, তাও যদি না পার তবে পার্শ্বদেশে ভর করে।" (বুখারী ও অন্যান্য)

যাকাত: যাকাত হলো আপনার মালের অতি সামান্য অংশ। যা আপনি প্রদান করবেন মুসলমানদের প্রয়োজনে এবং ফকীর, মিসকীন, মুসাফির, ঋণগ্রস্থ ও অন্যান্য যাকাতের হক্বদারকে। (যাতে ফকীর উপকৃত হবে কিন্তু ধনি ক্ষতি গ্রস্থ হবেনা)।

রোযা: রোযা হলো বছরে এক মাস। আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (سورة البقرة:١٨٥)

অর্থাৎ: আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফর অবস্থায় তার জন্য অপর কোন দিন হতে গণনা করবে। (সূরা বাকারা: ১৮৫)

যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী অপারগতার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম সে প্রত্যেক দিনে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে।

হজ্জ: সক্ষম ব্যক্তির উপর জীবনে মাত্র একবার বায়তুল্লাহর হজ্জ করা..। এগুলিই হলো আল্লাহর মৌলিক অধিকার; এ ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তা ঘটনা ক্রমে কখনো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যেমন: আল্লাহর পথে জিহাদ বা এমন কোন কারণে আপনাকে বাধ্য করে, যেমন: মাজলূম-অত্যাচারীতকে সাহায্য করা।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এই অধিকার সামান্য কিন্তু বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনেক, যদি এ অধিকার সমূহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তবে ইহকাল ও পরকালে হবেন সৌভাগ্যবান, এবং মুক্তি পাবেন জাহান্নাম থেকে আর প্রবেশ করবেন জান্নাতে। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (سورة آل عمران:١٨٥)

অর্থাৎ: অতএব, যাকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে ফলত; সেই সফলকাম, আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়। (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

দ্বিতীয়: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অধিকার

এই অধিকার হলো সৃষ্টিকুলের সবচেয়ে বড় অধিকার। রাসূলুল্লাহর অধিকারের চেয়ে বড় অধিকার সৃষ্টিকুলের আর কারো নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (سورة الفتح: ٨-٩)

অর্থাৎ: আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে , সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূল (ﷺ)কে সাহায্য কর ও সম্মান কর।

(সূরা ফাতহ: ৮-৯)

এজন্যই সমস্ত মানুষের মহব্বত অপেক্ষা নাবী (ﷺ) কে সর্বাধিক মুহাব্বাত করা অপরিহার্য, এমন কি স্বীয় আত্মা, সন্তান, পিতা অপেক্ষা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين..)

অর্থাৎ: তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম না হব। (বুখারী ও মুসলিম)

নাবী (ﷺ)কে শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হলো তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তবে সে সম্মান হবে যথোপযুক্ত, সীমালঙ্ঘন করে নয়।

তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সম্মান প্রদান হলো: তাঁর সুন্নাত ও মহান ব্যক্তি স্বত্তার মর্যাদা প্রদান এবং তাঁর মৃত্যুর পর সম্মান হলো: তাঁর সুন্নাত ও সরল-সঠিক ত্বরীকার সম্মান করা।

যারা রাসূল (ﷺ) এর প্রতি, সাহাবায়ে কেরামের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের প্রত্যক্ষদর্শী তারাই উপলব্ধী করেন যে, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জন্য যা করণীয় তা তারা কি ভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন।

যেমন: কুরাইশ বংশের প্রতিনিধি হিসেবে ওরুয়া ইবনে মাসউদ নাবী (ﷺ) এর নিকট হুদাইবিয়ার সন্ধিতে প্রেরিত হওয়ার পর ফিরে এসে তাদেরকে সম্বোধন করে বলে: আমি রোম সম্রাট কাইসার, পারস্য সম্রাট কেসরা, আবিসিনিয়া সম্রাট নাজাসী ও বহু সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়েছি কিন্তু মুহাম্মাদের সাহাবারা মুহাম্মাদ (ﷺ) কে যে ভাবে শ্রদ্ধা করছে এ ধরণের শ্রদ্ধা করতে আর কারো কোন অনুসারীকে দেখিনি। যখন তিনি তাদেরকে কোন আদেশ করেন তারা সঙ্গে সঙ্গে পালন করে, যখন তিনি ওজু করেন তারা যেন ওজুর পানির জন্য লড়াই শুরু করে দিবে, যখন কেউ তাঁর সামনে কথা বলছে একেবারে নিম্নস্বরে এবং তাঁর সম্মানের কারণে কেউ তাঁর প্রতি

তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করেনা। (দেখুন: শায়খ আব্দুল্লাহ বিন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের মুখতাসার সীরাতুর রাসূল পৃ: ৩০০)

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে মজ্জাগত আদর্শ, চরিত্র নম্রতা ও সরলতা প্রদান করেছেন যার কারণে তারা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর এ ধরনের সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন, পক্ষান্তরে তিনি যদি রূঢ় ও কঠোর চরিত্রের অধিকারী হতেন তবে অবশ্যই তারা তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

নাবী (ﷺ) এর অন্যান্য অধিকারের মধ্যে তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের যে সব বিষয়ের খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, যা কিছুর আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা কিছু নিষেধ ও সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং নিশ্চয়ই তাঁরই ত্বরীকা ও তাঁরই শরীয়ত যে পরিপূর্ণ তার প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং তার উপর কোন শরীয়ত ও কোন ত্বরীকাকে প্রাধ্যন্য না দেয়া, তা যেখান থেকেই প্রবর্তিত হোক না কেন। আল্লাহর বাণী:

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ (سورة النساء:٦٥)

অর্থাৎ: কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীন বিরোধের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অত:পর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ না করে এবং তারা মানার মত মেনে নেয়। (সূরা নিসা: ৬৫)

তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة آل عمران: ٣١)

অর্থাৎ: তুমি বল: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়। (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

অত:পর নাবী (ﷺ) এর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হলো, অবস্থা ভেদে শক্তি-সামর্থ ও সাধ্যানুযায়ী তাঁর শরীয়ত ও ত্বরীকার পক্ষে লড়াই করা এমন কি অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে হলেও। সুতরাং শত্রু যদি দলীল ও সন্দেহ-সংশয় নিয়ে আক্রমণ করে তবে তার প্রতিবাদ করতে হবে জ্ঞান-প্রজ্ঞা, অকাট্য প্রমাণাদীসহ ও তাঁর ভ্রান্ততা প্রকাশের মাধ্যমে। আর যদি সে অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে আক্রমণ করে তবে তার প্রতিবাদ অনুরূপ শক্তির মাধ্যমেই করতে হবে।

অতএব, কোন মুমিনেরই এটা উচিৎ হবেনা যে, সে শরীয়তে মুহাম্মাদী বা তাঁর মহা ব্যক্তিস্বত্তার প্রতি আক্রমণের খবর শুনবে আর তার প্রতিবাদ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে চুপ থাকবে।

তৃতীয়: মাতা-পিতার অধিকার

সন্তান-সন্ততির উপর পিতা-মাতার প্রতি যে অধিকার রয়েছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কেননা মাতা-পিতাই হলো সন্তান জন্মের কারণ। এ জন্যই তার উপর তাদের বড় অধিকার। তা ছাড়াও তারা উভয়ে ছোট অবস্থায় তার লালন পালন করে তার আরামের জন্য তারা কষ্ট করে ও অনিদ্রায় কাটায়।

তোমার মাতা তোমাকে গর্ভে প্রায় নয় মাস বহন করে এবং তুমি তার খাদ্য গ্রহণ ও তার সুস্থতা সাপেক্ষে তার গর্ভে জীবিত থাক। আল্লাহ সেদিকে ইশারা করে বলেন:

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ (سورة لقمان:١٤)

অর্থাৎ: তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে .. (সূরা লুকমান: ১৪)

অত:পর মাতা তাকে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বহু কষ্টে কোলে করে দু বছর পর্যন্ত দুধ পান করায়।

আর পিতাও তোমার ছোট থেকে স্বয়ং সম্পণ্ন না হওয়া পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের জন্য ও উপযোগী খাদ্য-রুজীর সুব্যবস্থার জন্য সদায় সচেষ্ট থাকেন। আবার তোমার সঠিক প্রতিপালন ও নির্দেশনার জন্য ও সদা তৎপর থাকেন। তখন তুমি তোমার নিজের ভাল মন্দের কোন খবর রাখতেনা। এই জন্যই আল্লাহ সন্তানদেরকে মাতা-পিতার সাথে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ও তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেন এবং বলেন :

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (سورة لقمان:١٤)

অর্থাৎ: আমি তো মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (সূরা লোকমান: ১৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا .وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

অর্থাৎ: আর তোমার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে (বিরক্তি সূচক) উহ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মান সূচক নম্র কথা বলো। মায়া-মমতার সাথে

তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত কর এবং বলোঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিল। (সূরা বাণী ইসরাঈলঃ ২৩-২৪)

প্রিয় পাঠক! আপনার উপর মাতা পিতার অধিকার হলো যে, আপনি তাদের প্রতি সদয় হবেন, অর্থাৎ উভয়ের প্রতি আপনি কথা, কর্ম, অর্থ ও দৈহিক ভাবে সদ্ব্যবহার করবেন। আল্লাহর অবাধ্যতা এবং যাতে ক্ষতি সাধিত হবে তা ব্যতীত আপনি তাদের আদেশ পালন করুন। তাদের সাথে মিষ্টি ভাষায় হাসি মুখে কথা বলুন, যথাপোযুক্ত সাধ্যমত সেবা-যত্ন করুন, তাদের বার্ধক্য অসুস্থ ও দুর্বল অবস্থায় বিরোক্তিবোধ করবেন না, এ অবস্থায় তাদেরকে বোঝা মনে করবেন না, অচিরে আপনিও তাদের অবস্থায় পরিণত হবেন, আপনিও পিতা হতে যাচ্ছেন, যেমন তারা আপনার পিতা-মাতা যদি বেঁচে থাকেন আপনিও আপনার সন্তানদের নিকট বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হবেন, যেমন আপনার নিকটে আপনার পিতা-মাতা উপনীত হয়েছে সুতরাং আপনার ও সন্তানদের নিকট থেকে অনুগ্রহ, সহানুভুতি ও সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন হবে, যেমন আপনার পিতা-মাতা আপনার সদ্ব্যবহারের মুখাপেক্ষী।

অতএব আপনি যদি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে থাকেন তবে আপনি এর মহা প্রতিদানের ও অনুরূপ

ব্যবহারের শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন।

কেননা যে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে তার সাথে তারও সন্তানরা সদ্ব্যবহার করবে, আর যদি সে তার মাতা-পিতার অবাধ্য হয় তবে তারও সন্তান তার অবাধ্য হবে। সুতরাং কর্মের উপরই প্রতিফল নির্ভর করে অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। আল্লাহ তায়ালা মাতা পিতার অধিকারকে বড় ও উচ্চ স্থান দান করেছেন, কেননা তাদের অধিকার স্বীয় অধিকারের সাথে উল্লেখ করেন এবং

ইশারা করেন যে, তাদের অধিকার তার ও তাঁর রাসূলের অধিকারের শামিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (سورة النساء:٣٦)

অর্থাৎ: আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তার সাথে কাউকে শরীক করোনা এবং তোমার মাতা- পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর ।
(সূরা নিসা: ৩৬)

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ (سورة لقمان:١٤)

অর্থাৎ: তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তোমাদের মাতা-পিতার । (সূরা লোকমান: ১৪)

নাবী (ﷺ) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উপর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেমন ইবনে মাসউদের ﷺ হাদীসে রয়েছে তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বলেন: নামায সময় মত আদায় করা, আমি বললাম: অত:পর কোনটি? তিনি বলেন: মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বলেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)।

উক্ত ফজীলত মাতা-পিতার অধিকারের গুরুত্ব প্রমাণ করে, যে অধিকার অধিকাংশ মানুষেই লঙ্ঘন করে চলেছে এবং তারা পরিণত হয়েছে অবাধ্য সন্তান ও সম্পর্ক ছিন্নকারীতে। কোন কোন লোককে এমনও পাওয়া যাবে, সে মাতা-পিতার কোন অধিকারই বিবেচনা করে না, কখনো কখনো তাদেরকে তুচ্ছ মনে করে, ধমকা-ধমকি করে ও বকা দেয় ও তাদের সাথে চিল্লিয়ে কথা বলে, এ ধরনের লোক অতি সত্ত্বর ইহকালেই হোক বা পরকালে এর প্রতিদান পাবে।

চতুর্থ: সন্তানের অধিকার

ছেলে মেয়ে উভয় সন্তানের অন্তর্ভুক্ত। আর এই সন্তানের অধিকার অনেক। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

১। **লালন-পালন:** ধর্মীয় আচার- আচরণ এবং চরিত্র ও নৈতিকতা তাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দেয়া তারা যেন যথাযথ ভাবে তা ধারণ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (سورة التحريم:٦)

অর্থাৎ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা তাহরীম: ৬)

আর নাবী (ﷺ) বলেন:

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته.)

অর্থাৎ: তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে, পুরুষেরা পরিবারের দায়িত্বশীল সে তার দায়ীত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং সন্তান-সন্ততি হলো মাতা-পিতার ঘাড়ে একটি আমানত। তাই তারা উভয়ে সন্তানদের সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসীত হবে। তাদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক প্রতিফলনের মাধ্যমে পিতা-মাতা স্বীয় দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি পাবে এবং তার ফলে সন্তানেরাও সৎ হিসেবে গড়ে উঠবে অত:পর তারাই হবে পিতা-মাতার জন্য ইহকাল ও পরকালে চক্ষুশিতলকারী ও শান্তির কারণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (سورة الطور:٢١)

অর্থাৎ: আর যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্রও হ্রাস করবো না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজকৃত কর্মের জন্য দায়ী। (সুরা তুর: ২১)

নাবী (ﷺ) বলেন:

(إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) (رواه مسلم)

অর্থাৎ: "যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় তিনটি আমল ব্যতীত তার সব আমল বন্দ হয়ে যায়: (তিনটি আমল হলো:) সাদকা জারিয়া বা চলমান দান- খয়রাত, এমন জ্ঞান অর্জন যার মাধ্যমে পরবর্তীতেও উপকৃত হবে অথবা এমন সৎ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করবে"। (মুসলিম) এ হলো সন্তানকে আদব- শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার ফল। যদি তাদেরকে উত্তম ভাবে প্রতিপালন করা হয় তবে পিতা-মাতার জন্য তারা হবে উপকারী এমনকি মৃত্যুর পরেও।

প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ পিতা-মাতা সন্তানের এই অধিকার পালনে অবহেলা করে ও নষ্ট করে ফেলে, তাদেরকে ভুলে যায় এবং তাদের প্রতি যেন কোন দায়িত্বই নেই। তারা সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসাও করেনা তারা কোথায় গিয়েছিল, আর কখন ফিরল, তাদের সঙ্গী-সাথীই বা কারা? এমনকি তাদের উত্তম নির্দেশনা দেয়না এবং খারাপ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করেনা। তবে আশ্চার্যের ব্যাপার হলো এ সমস্ত লোক আবার স্বীয় ধন-সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে

যায়, লাভের জন্য রাত্রিতে তাদের নিদ্রা নেই অথচ অধিকাংশই দেখা যায় যে তাদের এ উপার্জন ও সংগ্রহ নিজের জন্য নয় বরং অন্যের জন্য। পক্ষান্তরে সন্তানদেরকে আদর্শ বানানো তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া ইহকাল ও পরকালের জন্য ধন সম্পদের তুলনায় অধিক উত্তম ও উপকারী।

সন্তানের শরীরের খাদ্য পানীয় ও পোষাক-পরিচ্ছেদ যোগানো পিতার প্রতি যেমন অপরিহার্য তেমনি পিতার উপর অপরিহার্য হলো সন্তানের অন্তরে জ্ঞান ও ঈমানের খোরাক যোগানো এবং তার আত্মাকে তাকওয়ার পোষাক পরানো আর তাই হলো কল্যাণকর।

২। সঠিক পন্থায় তাদের ব্যয়ভার বহণ করা:

অর্থাৎ তাদের জন্য পরিমিত খরচ করা, না অতিরিক্ত না কম করে, কেননা এটি হলো সন্তানের অধিকার এবং আল্লাহ তাকে যে ধন-সম্পদ ও নিয়ামত দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। অতএব, সে তার জীবদ্দশায় কৃপণতা করে তাদের উপর সম্পদ খরচ না করে তাদের জন্যই কি ভাবে জমা করে? অথচ তার মৃত্যুর পর জোর পূর্বক তারাই তা দখল করে নিবে?

এমনকি কোন পিতা যদি সন্তানদের প্রতি খরচ করতে কৃপণতা করে তবে ন্যায় সংগতভাবে প্রয়োজন মত তার সম্পদ থেকে নিজেরাই গ্রহণ করবে, যেমন রাসূল (ﷺ) এ ফতওয়া দিয়েছিলেন হিন্দা বিনতে উৎবাকে (বুখারী ও মুসলিম)

৩। পিতা যেন সন্তানদের মধ্যে কোন একজনকে তার সম্পদ থেকে বিশেষভাবে দান- হেবা হিসেবে প্রদান না করে। সুতরাং সে সন্তানদের মধ্যে কাউকে বিশেষ ভাবে কিছু প্রদান করে অন্যদেরকে বঞ্চিত করবে না, কেননা তা হলো অন্যায় ও জুলুম। আর আল্লাহ জালেম-অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না। আর এই দ্বীমুখীনীতি অবলম্বন বঞ্চিতদের জন্য অবজ্ঞা-ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের ও যাদেরকে প্রদান করা হবে উভয়ের মধ্যে বরং বঞ্চিত ও পিতার

মাঝেও মনমালিন্য ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে। কোন সন্তান পিতাকে অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশী সম্মান, সেবা ও সদ্ব্যবহার করে থাকে। এই জন্য পিতা তাকে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান স্বরূপ বিশেষ ভাবে হেবা-প্রদান করে থাকে। প্রতিদান স্বরূপ এভাবে প্রদান করা জায়েয নয়, কেননা তার সদ্ব্যবহারের প্রতিদান আল্লাহর নিকট।

সদ্ব্যবহারকারী সন্তানকে বিশেষভাবে কিছু প্রদান করার ফলে সে নিজেকে তাদের চেয়ে উত্তম ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মনে করে, যার কারণে অন্যরা দূরে সরে যায় এবং পিতার অবাধ্যতা তাদের মধ্যে আরো বাড়তে থাকে। অত:পর আমরা হয়ত জানিনা অবস্থার পরিবর্তনে অনুগত সন্তান অবাধ্য সন্তানে পরিণত হতে পারে কেননা অন্তর তো আল্লাহর হাতে তিনি তা যে ভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করে থাকেন।

বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, নুমান ইবনে বাশীর হতে বর্ণিত, তার পিতা বাশীর ইবনে সাদ তাকে একটি দাস প্রদান করে, এখবর সে নাবী (ﷺ) কে জানালে নাবী (ﷺ) বলেন: তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এভাবে দান করেছ? সে (বশীর) বলল: না, তিনি বলেন: তবে তা ফিরিয়ে নাও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন আল্লাহকে ভয় কর আর তোমাদের সন্তানদের প্রতি ইনসাফ কর। অন্ন্য বর্ণনার শব্দে এরূপও রয়েছে: এ ব্যাপারে তুমি অন্যজনকে স্বাক্ষী মান, আমি অন্যায়ের ক্ষেত্রে স্বাক্ষী হতে পারি না।

সুতরাং এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানদের মধ্যে কোন সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়া অন্যায়-অবিচার ও হারাম সাব্যস্ত করেন।

কিন্তু যদি সন্তানদের মধ্যে কারো কিছু প্রয়োজন রয়েছে অন্যের প্রয়োজন নেই, যেমন: হয়ত কোন সন্তানের শিক্ষা সামগ্রী বা চিকিৎসা বা বিয়ে-শাদীর প্রয়োজন রয়েছে অন্যের এগুলি প্রয়োজন নেই সে ক্ষেত্রে তার যা প্রয়োজন তাকে দেয়াতে কোন বাধা নেই, কেননা এটি তাকে দান করা হচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদে বরং এটি তার প্রতি ভরণ পোষণ খরচ দেয়ার শামিল।

পিতা যদি তার সন্তানের জন্য অপরিহার্য অধিকার যেমন: উত্তম প্রতিপালন ও খরচ বহন ইত্যাদী সার্বিক ভাবে পালন করে, তবে সে অবশ্য তার সন্তানের পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার লাভ ও তার অধিকার লাভে ধন্য হবে। আর যখন পিতার উপর তার সন্তানের জন্য যা অপরিহার্য তা পালন না করে তবে সে এর ফলে শাস্তি ভোগ করবে, কেননা তার সন্তান ও তার অধিকার প্রদানে অস্বীকার করবে যাতে তাকে কর্মের প্রতিফল যেমন কর্ম তেমন ফল পেতে হবে।

পঞ্চম: আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

এরা ঐ সমস্ত নিকটতম ব্যক্তিবর্গ যারা আপনার সাথে আত্মীয় সূত্রে আবদ্ধ, যেমন ভাই, চাচা, মামা ও তাদের সন্তান-সন্ততি এবং প্রত্যেক ঐ সমস্ত লোক যারা আপনার সাথে রক্ত সম্পর্কে সম্পৃক্ত। সুতরাং এই আত্মীয়দের মধ্যে যে যত নিকটতম তার তত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকার সুসাব্যস্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ (سورة الإسراء:٢٦)

অর্থাৎ: আর আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার অধিকার (সূরা বাণী ইসরাঈল: ২৬)

এবং তিনি আরো বলেন:

﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾

অর্থাৎ: আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথেও .. (সূরা নিসা: ৩৬)

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় নিকটাত্মীয়ের সাথে তার সম্মান বজায় রেখে দৈহিক কর্মের দ্বারা উপকার ও আর্থিক উপকার সাধণ করে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য, আর তা হবে আত্মীয়দের মধ্যে যে যত ঘনিষ্ট ও তাদের প্রয়োজন অনুপাতে। কেননা, তা শরীয়ত, যুক্তি ও সহজাত চরিত্রেরই দাবী।

আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব ও তার প্রতি উৎসাহিত করার ব্যাপারে বহু প্রমাণাদী রয়েছে যেমন বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত নাবী (ﷺ) বলেন: আল্লাহ যখন সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে তা থেকে অবসর হলেন তখন আত্মীয়তা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে বললো: এ মুহূর্তে আমি আপনার নিকট আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর আল্লাহ তায়ালা জবাব দেন হ্যাঁ! তবে কি তুমি এর উপর সন্তুষ্ট হবে না যে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব যে তোমার সম্পর্ক ঠিক রাখল, আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো যে তোমার সাথে ছিন্ন করবে? আত্মীয়তা সম্পর্ক বললো: জী হাঁ! আল্লাহ বলেন: তাহলে তোমার সাথে একথাই রইল অত:পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: তোমরা যদি চাও তো এই আয়াতটি পড়:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾

(سورة محمد:٢٢-٢٣)

অর্থাৎ: ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আল্লাহ ওদেরকেই লানত করেন এবং তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (সূরা মুহাম্মাদ: ২২-২৩)

নাবী (ﷺ) বলেন:

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.)

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকালের প্রতি ঈমান আনে সে যেন তার আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

অধিকাংশ লোকই এই অধিকার নষ্ট করে এবং এ ব্যাপারে উদাসীন। কেউবা এমনও আছে যে আত্মীয়তা সম্পর্কই বুঝে না। আত্মীয়কে না সে আর্থিক সহযোগিতা করে, না তাকে সম্মান করে, না

তার সাথে উত্তম ব্যবহার করে, কখনো এমন ঘটে যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু আত্মীয়দের না কোন খোজ খবর নেয়, না তাকে দেখতে যায়, না কিছু প্রদানের মাধ্যমে ভালবাসার প্রকাশ ঘটায়, না তাদের দু:খ-দুর্দশা ও প্রয়োজনের মুহূর্তে এগিয়ে আসে বরং কখনো এর বিপরীতে সে কথা বা কাজের মাধ্যেমে বা কখনো উভয়ের দ্বারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহারই করে থাকে। পক্ষান্তরে অনেককেই দেখা য়ায় নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যারা আত্মীয় নয় এ ধরণের লোকের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে। কিছু লোককে দেখা যায় যদি তার আত্মীয়-স্বজন তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তবে তারা তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে, পক্ষান্তরে আত্মীয় যদি সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে তারাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে: প্রকৃত পক্ষে এভাবে সম্পর্ক রাখা সম্পর্ক রাখা নয়, বরং এটি হলো যে ভাল ব্যবহার করে তার প্রতিদান দেয়া, আর এটি ঘটে থাকে আত্মীয় অনাত্মীয় সবার ক্ষেত্রে কেননা প্রতিদান মূলক ব্যবহারের জন্য আত্মীয়তা জরুরী নয়।

প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী তো সেই ব্যক্তি যে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে এবং সে ভ্রুক্ষেপও করে না আত্মীয়রা তার সাথে সম্পর্ক রাখল কি রাখল না। যেমন সহীহ বুখারীতে আছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস হতে বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.)

অর্থাৎ: "প্রতিদান মূলক সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি যখন তার সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলে তখন সে তা অটুট রাখে।"

এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করত: বলে: হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন আত্মীয় রয়েছে, তাদের সাথে আমি সম্পর্ক

বজায় রাখি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্ট সহ্য করি কিন্তু তারা আমার প্রতি বর্বরচিত আচরণ করে, এগুলি শুনে নাবী (ﷺ) বলেন: তুমি যা বললে পরিস্থিতি যদি এরূপই হয় তবে তো তুমি যেন তাদের চেহারাতে বালু নিক্ষেপ করলে, আর তুমি যতদিন এ অবস্থায় থাকবে আল্লাহর পক্ষ তেকে ততদনি তাদের বিপক্ষে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবে। (মুসলিম)

আত্মীয়তা সম্পর্কের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যে শুধু ইহকাল ও পরকালে রহমতকে তাদের জন্য প্রসারিত করেন, তাদের যাবতীয় কর্ম সহজ করে দেন ও তাদের বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এমনটি নয় বরং আত্মীয়তা- সম্পর্কের মাধ্যমে পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়, পরস্পরে ভালবাসা সৃষ্টি হয়, পরস্পরে সহনুভূতিশীল হয় এবং বিপদে-আপদে পরস্পরে সহযোগিতা করে, যার ফলে আপসে তাদের মধ্যে আরাম, আনন্দ ও শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে আর এগুলি বাস্তবে পরীক্ষিত ও সর্বজন স্বীকৃত।

পক্ষান্তরে আত্মীয়তা সম্পর্ক যদি ছিন্ন করা হয় তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি বিরাজ করে ও আপন লোকদের মধ্যে ব্যাপক দূরুত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

ষষ্টঃ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

বিবাহ বন্ধনের ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ও বড় ধরনের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং বিবাহ বন্ধন হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম, যার ফলে গড়ে উঠে পরস্পরের প্রতি দৈহিক, সামাজিক এবং আর্থিক অধিকার।

অতএব, স্বামী-স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য হলো তারা পরস্পরে সদ্ভাবে অবস্থান এবং পরস্পরের প্রতি অপরিহার্য অধিকার সমূহ টালবাহানা না

করে পূর্ণ উদারতা- সহৃদয়তা ও সহজভাবে আদায় করবে যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (سورة النساء:١٩)

অর্থাৎ: আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর। (সূরা নিসা: ১৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (سورة البقرة:٢٢٨)

অর্থাৎ: আর নারীদের উপর তাদের যেরূপ অধিকার আছে নারীদেরও তদ্দুনুরূপ ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্টত্বও রয়েছে। (সূরা বাকারা: ২২৮)

তেমনি নারীর জন্য অপরিহার্য হলো, তার উপর স্বামীর প্রতি যা করণীয় রয়েছে তা যেন আদায় করে।

(প্রিয় পাঠক / পাঠিকা!) স্বামী-স্ত্রী যদি প্রত্যেকে তাদের অধিকার সমূহ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করে তবে তাদের সার্বিক জীবন হবে সৌভাগ্যের ও বিরাজ করবে তাদের মাঝে সুসম্পর্ক। পক্ষান্তরে একে অপরের অধিকার যদি খর্ব করে তবে তাদের মধ্যে বিরাজ করবে অশান্তি, বিভেদ ও ঝগড়া-বিবাদ এবং পরস্পরের জীবন হবে দুর্দশা দুর্ভাগ্য ও দু:খ-কষ্টের।

নারীদের সাথে সদ্ভাব রাখার উপদেশ ও তাদের অবস্থা বিবেচনার জন্য বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে কেননা তাদেরকে পুরাপুরি বশে আনা কঠিন ব্যাপার। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء.)

অর্থাৎ: তোমরা নারীদের সাথে সদাচরণ কর, কেননা নারী পাঁজরের হাড় থেকে তৈরিকৃত, আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হলো উপরের অংশ, যদি সোজা করতে যাও তা ভেঙ্গে দিবে, আর যদি ছেড়ে দাও বাঁকাই থাকবে অতএব, তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

(إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها: طلاقها.)

অর্থাৎ: নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে তোমার (পছন্দমত) পন্থায় কখনই সে সোজা হবে না, অতএব, তুমি যদি এই বাঁকা অবস্থায় তার থেকে উপকৃত হতে চাও তো উপকৃত হও, কিন্তু তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও ভেঙ্গে দিবে, আর তাকে ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হলো তালাক। (সহীহ মুসলিম)

নাবী (ﷺ) আরো বলেন:

(لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً أخر.)

অর্থাৎ: কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিন মহিলাকে (তার স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে কেননা সে যদি তার কোন চরিত্রকে অপছন্দ করে তার অন্য চরিত্রকে সে পছন্দ করবে। (সহীহ্ মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস সমূহে পুরুষ নারীর সাথে কিরূপ আচরণ করবে নাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে তার উম্মতের প্রতি রয়েছে পূর্ণ নির্দেশনা।

অতএব, পুরুষের জন্য উচিত তার নারী থেকে যতটুকু ফাইদা গ্রহণ করা যায় তা সহজ ভাবে গ্রহণ করা, কেননা যে স্বভাবের করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা পরিপূর্ণ নয়, বরং তার মধ্যে অবশ্যই বক্রতা থাকবে। নারীকে যে প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে সে ভাবেই

তার মাধ্যমে পুরুষের উপকৃত হতে হবে নচেৎ সম্ভব নয়। উল্লেখিত হাদীসগুলিতে এ নির্দেশনা ও রয়েছে যে, মানুষের উচিত নারীর ভাল-মন্দ উভয় চরিত্র ও বৈশিষ্টের তুলনা করা। কেননা যদি তার কোন একটি অভ্যাস অপছন্দ করে তবে তার অন্য এমন চরিত্রও রয়েছে যা সে পছন্দ করবে। তার দিকে শুধু অপছন্দ ও কড়া নজরেই যেন না দেখে।

অনেক স্বামী রয়েছে যারা তাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ গুণাবলী কামনা করে থাকে কিন্তু তা অসম্ভব, এজন্যই তারা পতিত হয় দুর্দশা ও দুর্ভোগে এবং স্ত্রীদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে না বরং কখনো তাদের মধ্যে তালাক-বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها)

অর্থাৎ: "যদি তাকে সোজা করতে যাও ভেঙ্গে দিবে আর ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ তালাক- বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া।" অতএব, স্বামীর উচিত স্ত্রী যদি শরীয়ত বহির্ভুত ও তার মান ক্ষুণ্নকর কাজ না করে তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন তার প্রতি সরলতা ও উদাসিনতা প্রকাশ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾

অর্থাৎ: আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না। (সূরা নিসা: ১২৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের মাঝে পালা বন্টনে ইনসাফ করতেন এবং বলতেন:

(اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.)

অর্থাৎ: হে আল্লাহ এটি হলো আমার পালা বন্টণনীতি যা আমার আয়ত্বে সুতরাং যে ক্ষেত্রে আমার ইখতিয়ার নেই কিন্তু আপনি ইখতিয়ার রাখেন সে ব্যাপারে আমাকে ভর্তসনা করবেন না। (আহলুস সুনান থেকে বর্ণিত)

তেমনি যদি দুজনের মধ্যে একজনকে অন্য জনের অনুমতি সাপেক্ষে রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয় তবে কোন দোষ নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রী সওদার অনুমতি সাপেক্ষে তার ও আয়েশার পালায় আয়েশার নিকট রাত্রি যাপন করতেন। (আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত, বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন সেই অসুস্থতায় এভাবে প্রশ্ন করেছিলেন যে:(أين أنا غداً أين أنا غداً)

অর্থাৎ: আমি আগামী কাল কোথায় থাকবো? আমি আগামী কাল কোথায় থাকব? অত:পর তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে অনুমতি দেন তিনি যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারেন। তারপর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আয়েশার বাড়িতেই ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

১। স্বামীর অধিকার হলো, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারের চেয়ে বড়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾

(سورة البقرة:٢٢٨)

অর্থাৎ: আর নারীদের উপর তাদের যেরূপ অধিকার রয়েছে নারীদেরও তদনুরূপ ন্যায় সংগত অধিকার আছে এবং অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা বাকারা: ২২৮)

পুরুষ হলো নারীদের পরিচালক ও অভিভাবক। সে নারীর কল্যাণ ও উপকারের জন্য তাকে শাসন ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (سورة النساء:٣٤)

অর্থাৎ: পুরুষগণ নারীদের অভিভাবক। যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দিয়েছেন

এজন্য যে তারা ধন সম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে। (সূরা নিসা: ৩৪)

২। আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত স্বামীর আনুগত্য করবে, এবং তার গোপনীয়তা ও ধন সম্পদের সংরক্ষণ করবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها.)

অর্থাৎ: আমি যদি কাউকে সিজদার আদেশ প্রদানকারী হতাম তবে অবশ্যই নারীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করতে বলতাম।

(তিরমিজী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: হাদীসটি হাসান।)

তিনি (ﷺ) আরো বলেন:

(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.)

অর্থাৎ: যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানাতে আসার জন্য আহবান করে আর সে তাকে সাড়া না দেয় এর ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত হয়ে রাত্রী যাপন করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেস্তাগণ তার উপর অভিশাপ করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। স্ত্রী এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে স্বামী তাদ্বারা পূর্ণ ফায়েদা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়, এমনকি নফল ইবাদত হলেও তাতে লিপ্ত হবে না। কেননা নাবী (ﷺ) বলেন:

(لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.)

অর্থাৎ: স্বামী যদি বাড়ীতে উপস্থিত থাকে তবে কোন মহিলার জন্য তার অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোজা রাখা উচিত নয় এবং না তার অনুমতি ব্যতীত বাড়িতে কাউকে অনুমতি দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্ত্রীর উপর স্বামীর সন্তুষ্টিকে স্ত্রীর জান্নাতে প্রবেশের কারণ সাব্যস্ত করেন। যেমন তিরমিজী উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন যাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.)

অর্থাৎ: যে মহিলা এমন অবস্থায় মারা গেল যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (হাদীসটি ইবনে মাজাহ ও তিরমিজী বর্ণনা করেন এবং তিরমিজী বলেন হাদীসটি হাসান, গরীব।)

সপ্তম: শাসক ও জনগণের অধিকার

শাসকগণ হলো মুসলমানদের কার্যনির্বাহী, চাই তিনি জেনারেল শাসক হোন, যেমন রাষ্ট্রপতি অথবা তিনি বিশেষ শাসক হোন যেমন কোন নির্ধারিত প্রশাসন প্রধান, কোন নির্ধারিত কার্যনির্বাহী প্রভৃতি। তাঁদের অনুসারীদের উপর তাঁদের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে যা পালন করা অপরিহার্য, তেমনি তাঁদের উপর তাঁদের অনুসারীদের অধিকার রয়েছে।

শাসকদের উপর জনগণের অধিকার: আল্লাহ শাসকদের উপর যে আমানত অর্পন করেছেন তা পালন করা। যেমন জনগণের হিতাকাঙ্খী হওয়া এবং তাদেরকে নিয়ে যে পথে চললে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের গ্যারান্টী রয়েছে সে পথে চলা। আর তা সম্ভব মুমিনদের পথের অনুসরণের মাধ্যমে। যে পথে ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেননা সে পথেই রয়েছে তাঁদের ও জনগণের মুক্তি ও

সৌভাগ্য। এর মাধ্যমে গড়ে উঠবে শাসকদের প্রতি জনগণের সন্তুষ্টি ও সম্মতি, পরস্পরে সম্পর্ক ও যোগাযোগ, তাঁদের আদেশসমূহ বিনয়ের সাথে তারা প্রতিপালন করবে এবং তাদেরকে যে দায়িত্ব তাঁরা দিবেন তা রক্ষা করবে। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করবে তাকে আল্লাহ লোকদের থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে তার ক্ষেত্রে লোকদের সন্তুষ্টি ও সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কেননা অন্তর তো আল্লাহরই হাতে তিনি যে ভাবে চান সেভাবেই পরিবর্তন করে থাকেন।

জনগণের উপর শাসকদের অধিকার হলোঃ

শাসকগণ জনগণের যে দায়িত্ব পালন করেন সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তাদেরকে সুপরামর্শ দেয়া, তাদের করণীয় দায়িত্বে উদাসীন পরিলক্ষিত হলে সচেতন করা, হক্ব থেকে অন্য দিকে ধাবিত হলে, তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করা, আল্লাহর অবাধ্যতায় না হলে তাদের আদেশ মেনে চলা। কেননা এর মাধ্যমে শরীয়তের কাঠামো ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, পক্ষান্তরে তাদের বিরোধিতা ও অবাধ্যতার কারণে শরীয়তের বিধি-বিধানে বিরাজ করবে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ও তাঁর রাসূলের এবং শাসকমন্ডলীর অনুসরণ করার নির্দেশ দেন,তাই তো আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (سورة النساء:٥٩)

অর্থাৎ: হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং যারা তোমাদের শাসকমন্ডলী আছে তাদের।

(সূরা নিসা: ৫৯)

নাবী (ﷺ) বলেন:

(على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). (متفق عليه)

অর্থাৎ: মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য হলো, সে যেন শুনে এবং মেনে চলে, তা চাই তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাপের কাজের আদেশ দেয়া না হবে, যদি তাকে পাপ কাজের আদেশ দেয়া হয় তবে তা শুনবেও না মানবেও না। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন: এক সফরে আমরা নাবী (ﷺ) এর সাথে ছিলাম, যখন আমরা এক স্থানে অবতরণ করলাম রাসূলুল্লাহর আহ্বানকারী আহ্বান করল: الصلاة جامعة। (নামায সমুপস্থিত) অত:পর আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট একত্রিত হলাম, অত:পর তিনি বলেন আল্লাহ যে নাবীই প্রেরণ করেন তার দায়িত্ব ছিল যে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যা ভাল মনে করেন তা তাদেরকে নির্দেশ করবেন এবং যা কিছু খারাপ মনে করেন তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করবেন। আর নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মতের প্রথম যুগে নিরাপত্তা রয়েছে, এরপর তাদের শেষ যুগে রয়েছে নানা ফিতনা ও এমন নানান কর্মকান্ড যা তোমরা অপছন্দ করবে। এক ফিতনা আসবে যার একাংশ অন্য অংশকে দুর্বল করে ছাড়বে। ফিতনা আসবে তো মুমিন বলবে: এ তো আমাকে ধ্বংশ করবে, অন্য আরো একটি ফিতনা আসবে তারপর মুমিন বলবে এতো সেই ফিতনা, অতএব, যে পছন্দ করে যে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তবে তার মৃত্যু যেন আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান থাকা অবস্থায় হয়, এবং সে যেন নিজের প্রতি যা আসা পছন্দ করে তা যেন লোকদের প্রতিও পছন্দ করে, আর যে ব্যক্তি কোন ঈমামের নিকট বাইয়াত করত: তার হাতে হাত দিয়ে তাকে আন্ত রিকতার সাথে গ্রহণ করল তবে সে যেন যথাসাধ্য তাঁর অনুসরণ

করে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কেউ সেখানে এসে তার সাথে বিরোধ করে তাবে তোমরা তার গর্দান উড়িয়ে দাও। (মুসলিম)

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করে বলে: হে আল্লাহর নাবী, আপনি কি মনে করেন! আমাদের উপর যদি এমন শাসক অধিষ্ঠিত হয় যারা তাদের অধিকার আমাদের নিকট থেকে দাবি করে এবং আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না, সুতরাং আপনি (এক্ষেত্রে) আমাদেরকে কি আদেশ দেন? (তা শুনে) নাবী (ﷺ) তার থেকে বিমূখ থাকলেন, অত:পর লোকটি দ্বিতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, অত:পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: তাদের কথা শুন এবং অনুসরণ কর, কেননা তাদের দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর এবং তোমাদের দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর। (মুসলিম)

জনগণের উপর শাসকদের আরো অধিকার হলো, জনগণ শাসকদের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা করবে, যার ফলে তারা যে ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত জনগণের সাহায্যে তা যেন বাস্তবায়ণ করতে পারে। প্রত্যেকে যেন সমাজের মধ্যে স্বীয় ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় কেননা এর ফলে সমাজের কর্ম-কান্ড আশানুরূপ হবে। পক্ষান্তরে জনগণ যদি শাসকদের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা না করে তবে তাঁরা আশানুরূপ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

অষ্টম: প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশী হলো, যে আপনার বাড়ীর পার্শ্বে বসবাস করে, তার প্রতি রয়েছে আপনার বড় অধিকার। (প্রতিবেশী সাধারণত: চার ধরণের হয়ে থাকে:)

(১) প্রতিবেশী যদি মুসলিম ও আত্মীয় হয়, তবে তার তিনটি অধিকার: প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার, আত্মীয় ও ইসলামের অধিকার।

(২) প্রতিবেশী যদি আত্মীয় না হয় কিন্তু মুসলিম, তবে তার ২টি অধিকার: প্রতিবেশীর ও ইসলামের অধিকার।

(৩) অনুরূপ প্রতিবেশী যদি আত্মীয় হয় কিন্তু মুসলিম নয় তবেও ২টি অধিকার: প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের অধিকার।

(৪) আর যদি প্রতিবেশী আত্মীয় ও মুসলিম না হয় তবে তারও একটি অধিকার, তা হলো প্রতিবেশীর অধিকার।

(তাফসীর ইবনে কাসীর: সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ ﴾ (سورة النساء:٣٦)

অর্থাৎ: আর তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং সদ্ব্যবহার কর আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, ফকীর- মিসকীনদের সাথে এবং সম্পর্কীয় প্রতিবেশী ও সম্পর্কহীন প্রতিবেশীর সাথে। (সূরা নিসা: ৩৬)

আর নাবী (ﷺ) বলেন:

(مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه.)

অর্থাৎ: জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর (অধিকার) সম্পর্কে নসীহত করতেই থাকেন এমনকি আমার ধারণা হয়ে যায় যে তিনি তাকে আমার ওয়ারিস- উত্তরাধিকার বানিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

অত:পর প্রতিবেশীর উপর অন্য প্রতিবেশীর অধিকার হলো: যতদূর সম্ভব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান প্রদান ও বিভিন্ন উপকার সাধনের মাধ্যমে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(خير الجيران عند الله خيرهم لجارهم.)

অর্থাৎ: আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হলো যে তাদের মধ্যে স্বীয় প্রতিবেশীর নিকট উত্তম। (হাদীসটি তিরমিজী বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাসান-গরীব হাদীস)

তিনি আরো বলেন:

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره.)

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে (মুসলিম)। তিনি আরো বলেন:

(إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك..)

অর্থাৎ: তুমি যখন কোন তরকারী রান্না করবে তখন তার ঝোল বাড়িয়ে দিবে এবং প্রতিবেশীর খবর নিবে। (মুসলিম)

তেমনি প্রতিবেশীকে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপহার প্রদান করাও সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। আর উপহার প্রদানে আপোসে ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং শত্রুতা দূর হয়।

প্রতিবেশীর আরো অন্যান্য অধিকার হলো: প্রতিবেশীকে কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.)

অর্থাৎ: আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, তাঁরা (সাহাবাগণ) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল কে? (মুমিন নয়) তিনি বলেন: যার কষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় (বুখারী)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

(لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)

অর্থাৎ: যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।

হাদীসে বর্ণিত "বাওয়ায়েক" শব্দের অর্থ হলো: অনিষ্ট-অন্যায়, সুতরাং হাদীস থেকে বুঝা গেল যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে মুমিন নয় এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (নাঊজুবিল্লাহ মিন জালিক)

বর্তমানে অধিকাংশ লোকই প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দেয়না এবং তাদের প্রতিবেশী তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়। সুতরাং সব সময় তাদেরকে দেখা যায় তারা প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ মতবিরোধে লিপ্ত ও অধিকার সমূহ খর্ব করে চলেছে, কথায় ও কাজে কষ্ট দিয়ে চলেছে, আর এগুলি হলো যা আল্লাহ ও তার রাসূল নির্দেশ করেছেন তার বিপরীত এবং মুসলমানদের নীতি বিরোধী। যা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং পরস্পরের মান-সম্মান খর্ব করার দিকে নিয়ে যায়।

নবম: সাধারণ মুসলমানের অধিকার

মুসলমানের অধিকার অনেক বেশী: যেমন: সহীহ হাদীসে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه ، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه.)

অর্থাৎ: মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ৬টি অধিকার: (১) যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবে সালাম দিবে (২) যখন দাওয়াত দিবে গ্রহণ করবে (৩) যখন পরামর্শ চায় পরামর্শ দিবে (৪) যখন হাঁচি দিয়ে সে "আল হামদু লিল্লাহ" বলবে তুমি তার জবাব দিবে (৫) যখন সে অসুস্থ হবে দেখা- শুনা ও সেবা করবে (৬) যখন সে মারা যাবে জানাযায় শরীক হবে। (মুসলিম)

উক্ত হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি কতিপয় অধিকার বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অধিকার সালাম বিনিময়

সালাম প্রদান হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। সালাম হলো মুসলমানদের পরস্পরে ভালবাসা ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণ। যা বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায় এবং নাবী (ﷺ) এর বাণীও তা প্রমাণ করে:

(والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.)

অর্থাৎ: আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মোমিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না আর যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে ভাল না বাসতে শিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের খবর দিব না যদি তা তোমরা বাস্তবায়ন কর তবে একে অপরকে ভালবাসবে? তোমাদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি সালামের মাধ্যমে তার সাথে কথা বার্তা শুরু করতেন এবং তিনি যখন শিশুদের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হতেন, তাদেরকেও সালাম দিতেন।

সালামের সুন্নতী পদ্ধতি হলো: ছোট বড়কে, অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যক লোককে এবং আরোহী পদাতিককে সালাম দিবে। কিন্তু যদি এ সুন্নতী পদ্ধতি অনুযায়ী যার পূর্বে সালাম দেয়া উচিত সে যদি না দেয় তবে যেন অন্যরা সালাম প্রতিষ্ঠা করে যাতে সালাম প্রদান বন্ধ না হয়ে যায়, সুতরাং ছোট যদি সালাম না দেয় তবে বড় যেন সালাম দেয়, তেমনি অল্প সংখ্যক লোক যদি সালাম না দেয় তবে যেন নেকী অর্জনের জন্য অধিক সংখ্যক লোকেরা সালাম প্রদান করে।

আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: যে ব্যক্তি তিনটি স্বভাব একত্র করলো সে ঈমান পরিপূর্ণ করল: (১) নিজের প্রতি ইনসাফ (২) সবার প্রতি সালাম প্রদান (৩) অভাবের সময় দান খয়রাত। (বুখারী)

সালাম প্রদান করা সুন্নাত কিন্তু তার উত্তর দেয়া ফরজে কেফায়া, যদি কেউ উত্তর দেয় তবে অন্যদের জন্যও তা যথেষ্ট হবে। সুতরাং কেউ যদি একটি দলের প্রতি সালাম দেয় আর তাদের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দেয় তবে তা

অবশিষ্টদের জন্য যথেষ্ট হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (سورة النساء:٨٦)

অর্থাৎ: যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম ভাবে উত্তর দাও অথবা তার মতই উত্তর দাও। (সূরা নিসা: ৮৬)
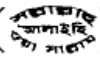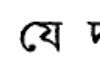
অতএব সালামের উত্তরে শুধু শুভেচ্ছা-স্বাগতম বা শুভেচ্ছা মূলক কোন কথা বলাই যথেষ্ট নয়। কেননা তা সালামের চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ নয়। সুতরাং কেউ যদি বলে: "আস সালামু আলাইকুম" উত্তরে যেন বলে: "আলাইকুমুস সালাম" কেউ যদি বলে: স্বাগতম তার উত্তরে অনুরূপ বলবে, আর যদি সালামের উত্তর বৃদ্ধি করা হয় তবে তা উত্তম।
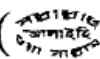
দ্বিতীয় অধিকার: "দাওয়াত দিলে গ্রহণ করবে" অর্থাৎ যখন কোন মুসলমান তোমাকে তার বাড়ীতে খাওয়া বা অন্য কোন কারণে আহবান জানাবে তখন তার ডাকে সাড়া দিবে, দাওয়াত গ্রহণ করা হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, কেননা দাওয়াত গ্রহণের ফলে দাওয়াতকারীকে মূল্যায়ন করা হয় এবং ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। তবে এ থেকে বিবাহের ওয়ালীমার দাওয়াত আরো ভিন্ন ব্যাপার কেননা ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ করা নির্ধারিত কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ওয়াজিব [১]।

---

[১] (শর্তগুলি নিম্নরূপ: ১। দাওয়াত যেন প্রথম দিন হয় ২। দাওয়াতকারী যেন মুসলমান হয় ৩। দাওয়াতকারী থেকে যদি আলাদা থাকা হারাম হয় ৪। যদি নির্ধারিত করে দাওয়াত দিয়ে থাকে ৫। তার উপার্জিত মাল যেন হালাল হয় ৬। অনুষ্ঠানে যদি

কেননা নাবী (ﷺ) এর বাণী (ومن لم يجب فقــد عــصى الله ورســوله) অর্থাৎ যে দাওয়াত গ্রহণ করল না সে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করল। (বুখারী ও মুসলিম)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী "যখন তোমাকে আহবান করবে সাড়া দাও" এমন কি সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যও ডাকা এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব মুসলমানের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য আপনি আদিষ্ট, সুতরাং সে যদি আপনাকে কোন কিছু বহন বা নিক্ষেপ বা এ ধরনের অন্য কোন সাহায্যের জন্য আহবান করে তবে অবশ্যই আপনি তার সাহায্যের জন্য আদিষ্ট, কেননা নাবী (ﷺ) এর বাণী:

(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)

মুমিন অন্য মুমিনের জন্য ভবন সদৃশ তার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। (বুখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় অধিকার: "সে যদি নসীহত কামনা করে, তবে তাকে নসীহত কর:" অর্থাৎ যখন মুসলমান ব্যক্তি আপনার নিকট এসে কোন ব্যাপারে সদুপদেশ চাইবে তাকে সদুপদেশ দিবেন, কেননা তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন নাবী (ﷺ) বলেন: الـــدين النـــصيحة। "দ্বীন হলো নসীহতের" আমরা বললাম কার জন্য ? তিনি বলেন: আল্লাহর জন্য এবং তার কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম ও সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

যদি মুসলামান ব্যক্তি আপনার নিকট পরামর্শ গ্রহণের জন্য নাও আসে, আর আপনি লক্ষ্য করছেন যে, সে যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে তার ক্ষতি বা পাপ রয়েছে এমতাবস্থায় আপনি তাকে নসীহত করুন

অনৈসলামিক কার্যকলাপ না হয় যা সে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখেনা। (আল সালসাবিল ফি মারেফাতিদ দলীল, পৃ: ৭৩৫)

যদিও সে আপনার নিকট আসে নাই। কেননা এটা হবে মুসলমানের নিকট থেকে ক্ষতি ও অপছন্দনীয় বস্তু দূরীভূত করা।

পক্ষান্তরে সে যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে তাতে যদি তার কোন ক্ষতি বা পাপ না থাকে তবে আপনার তার প্রতি নসীহত করা জরুরী নয় তবে যদি সে এমতাবস্থায় ও আপনার পরামর্শ কামনা করে পরামর্শ দেয়া জরুরী।

চতুর্থ অধিকারঃ "যদি হাঁচি দিয়ে 'আল হামদুলিল্লাহ' বলে তার উত্তর দাও।"

অর্থাৎ: আপনি তার জন্য বলেন: يرحمك الله "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) সে ব্যক্তি যেহেতু হাঁচির সময় তার প্রতিপালকের প্রশংসা করল তাই তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই দোয়া।

আর যদি হাঁচি দাতা হাঁচি দিয়ে "আল-হামদুলিল্লাহ" না বলে তবে সে দোয়া পাওয়ার অধিকার রাখেনা, কেননা সে যেহেতু আল্লাহর প্রশংসা করল না তাই তার বদলা হলো হাঁচির জবাব না দেয়া।

হাঁচিদাতা যদি "আলহামদু লিল্লাহ" বলে, তবে তার জবাব দেয়া ফরজ, এরপর পুনরায় তার জবাব দেয়া ওয়াজিব সুতরাং এ ক্ষেত্রে জবাব দেয়ার সময় হাঁচি দাতা বলবে: يهديكم الله ويصلح بالكم (ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলেহু বালাকুম) অর্থাৎ "আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়াত দিন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করুন।" তার হাঁচি যদি চলতেই থাকে তাতে তিনবার উত্তর দিবে এবং চতুর্থ বার তার জন্য "ইয়ারহামুকাল্লাহ" এর পরিবর্তে "আফাকাল্লাহ" (আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন) বলবে।

পঞ্চম অধিকার

"অসুস্থ হলে তাকে পরিদর্শন করবে ও খোঁজ-খবর নিবে।"

এটি হলো তার জন্য তার মুসলিম ভাইদের উপর অধিকার, সুতরাং তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। আর আপনি রোগীর যত

নিকটতম আত্মীয়, সংগী ও পড়শী হবেন তার পরিদর্শনের তত গুরুত্ব বাড়বে। রোগীকে পরিদর্শন করার মাত্র তার ও রোগের অবস্থা সাপেক্ষে কম বেশী হবে, কেননা পরিস্থিতির বিবেচনায় তা কখনো বেশী-বেশী কখনো কম প্রয়োজন হতে পারে। অতএব রোগীর অবস্থা বিবেচনা করা উত্তম।

যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যাবে তার জন্য সুন্নতি পদ্ধতি হলো, সে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এবং তার জন্য দোয়া করবে ও তাকে কষ্ট লাঘব হওয়ার ও অচিরেই রোগ মুক্তি পাওয়ার আশ্বাস দিবে, কেননা এটি সুস্থতা ও আরোগ্য লাভের অন্যতম কারণ। সে যেন আতঙ্ক গ্রস্থ না হয় এমন পদ্ধতিতে তাকে তাওবা করতে বলতে হবে, যেমন তাকে এ ধরণের বলবে: নিশ্চয়ই এই রোগের ফল আপনি ভাল পাবেন, কেননা রোগের মাধ্যমে আল্লাহ ভুল-ক্রটি ও পাপ সমূহ মিটিয়ে দেন, আপনি এমতাবস্থায় বসে থেকে দোয়া, জিকর, ও ইস্তিগফার বেশী বেশী করে অধিক নেকী অর্জন করতে পারেন।

৬ষ্ট অধিকার: "ইন্তেকাল করলে জানাযায় শরীক হও"

জানাযায় শরীক হওয়া তার মুসলিম ভাইয়ের অধিকার সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং এর মধ্যে রয়েছে বড় সওয়াব। নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

(من تبع الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان قيل: ما القيراطان ؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.)

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়া পর্যন্ত জানাযার অনুসরণ করল তার জন্য এক কিরাত (নেকী) আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত জানাযার অনুসরণ করল তার জন্য রয়েছে দুই কিরাত। জিজ্ঞাসা করা হলো: দুই কিরাত কি? তিনি বলেন: দুই বড় পাহাড় সমতুল্য।

(বুখারী ও মুসলিম)

সপ্তম অধিকার: কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা

মুসলমানকে কষ্ট দেয়া একটি মহাপাপ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (سورة الأحزاب:٥٨)

অর্থাৎ: মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদের পীড়া দেয়,তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। (সূরা আহযাব: ৫৮)

যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কষ্ট দিয়ে চড়াও হয় আল্লাহ সাধারণত তার থেকে পরকালের পূর্বেই ইহকালে প্রতিশোধ নিয়ে নেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(لا تباغضوا ولا تدابروا و كونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ولا يحقره بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه.)

অর্থাৎ: পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করো না, পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না বরং বান্দায় পরিণত হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও, মুসলমান হলো মুসলমানের ভাই না সে তার উপর জুলম করে না তাকে অসহায় রেখে পরিত্যাগ করে আর না তাকে তুচ্ছ মনে করে। কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-হীন মনে করবে। মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত- মান সম্মান হারাম। (সহীহ মুসলিম)

(সম্মানিত পাঠক!) মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকার অনেক কিন্তু এক্ষেত্রে উপযুক্ত ও যথার্থ হলো নাবী (ﷺ) এর বাণী: (المسلم أخو المسلم) অর্থাৎ মুসলমান হলো মুসলমানের ভাই।

অতএব, আপনি যখন এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ তখন এর দাবী হলো, ঐ সমস্ত জিনিস তার জন্য গ্রহণ করুন যা তার জন্য কল্যাণকর এবং ঐ সমস্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকুন যা তার জন্য ক্ষতিকর।

দশম অধিকারঃ অমুসলিমদের অধিকার

সমস্ত কাফের জাতি অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত, আর তারা চার শ্রেণীর: ১। যুদ্ধরত ২। নিরাপত্তা গ্রহণকারী ৩। চুক্তিবদ্ধ ৪। জিম্মী।

প্রথমতঃ যুদ্ধরত অমুসলিমঃ যারা মুসলমানদের সাথে সংগ্রাম ও বিরোধীতায় লিপ্ত তাদের সংরক্ষণ ও পৃষ্টপোষকতা মুসলিমদের উপর জরুরী নয়।

দ্বিতীয়তঃ নিরাপত্তা গ্রহণকারীঃ যারা মুসলিম দেশে মুসলিম শাসকের নিকট নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপত্তা গ্রহণ করে, তাদেরকে ঐ নির্ধারিত স্থান ও সময়ে নিরাপত্তা প্রদান অপরিহার্য, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (سورة التوبة:٦)

অর্থাৎ: মুশরিকদের (অমুসলিমদের) মধ্যে থেকে কেই তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অত:পর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দাও । (সূরা তাওবা: ৬)

তৃতীয়তঃ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমঃ যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, অতএব যতদিন পর্যন্ত তারা চুক্তির উপর অটল থাকবে এর কোন কিছুই ভঙ্গ করবে না, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করবে না ও ইসলাম ধর্মকে বিদ্রুপ করবে না, ততদিন তাদের

সাথে যে সময় পর্যন্ত চুক্তি করা হয়েছে সে সময় পর্যন্ত তা পূর্ণ করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورة التوبة:٤)

অর্থাৎ: তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি তাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা: ৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾(سورة التوبة:١٢)

অর্থাৎ: আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথ সমূহ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে, তবে তোমরা কুফুরের শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, এই অবস্থায় তাদের শপথ আর রইল না। (সূরা তাওবা: ১২)

চতুর্থত: জিম্মী অমুসলিম: যারা ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া-কর দিয়ে বসবাস করে। ইসলামে এদের প্রতি অন্যান্য অমুসলিমদের চেয়ে অধিকার বেশী। কেননা তারা কর প্রদান করে অমুসলিম রাষ্ট্রের তত্ত্বাবোধন ও সংরক্ষণে বসবাস করে।

সুতরাং মুসলিম শাসকদের কর্তব্য হলো,তাদের জান, মাল ও ইজ্জত-সম্মানের উপর ইসলামী বিধান জারী করা এবং তারা যা কিছু হারাম মনে করে সে সব ক্ষেত্রে বিধান আরোপ ও তাদের বিপদ-

আপদ ও দু:খ দূর করে পিরাপত্তা নিশ্চত করা। তবে তাদের জন্য মুসলমানদের পৃথক পোশাক গ্রহণ করা জরুরী, ইসলামের মধ্যে তারা যেন খারাপ কিছু প্রকাশ না করে অথবা তাদের ধর্মের যেগুলি বিশেষ কার্যকলাপ যেমন সিঙ্গা, ঘন্টা বাজান, ক্রুশ ব্যবহার থেকে দূরে থাকে।

আহলে ইলমদের কিতাব সমূহে জিম্মী বিষয়ক বিধি- বিধান বিস্ত ারীত রয়েছে যার কারণে এখানে আর দীর্ঘায়িত করলামনা। (যেমন, দেখুন: ইবনে কাইয়্যেমের আহকামু আহলিজ জিম্মাহ)

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين..

حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة

(باللغة البنغالية)

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)

ترجمة: محمد عبدالرب عفان